এখনো ঘোড়ার চাল বাকি

রিফাত হাসান

ভূমিপ্রকাশ

সৃজনশীলতার উৎকর্ষে...

১০৩

এখনো ঘোড়ার চাল বাকি ১ম পর্ব
রিফাত হাসান
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০
© লেখক ২০২০
প্রচ্ছদ সজল চৌধুরী
অলংকরণ সজল চৌধুরী
অক্ষরবিন্যাস লেখক
বানান সংশোধন ও বর্ণ অলংকরণ সজল চৌধুরী

ভূমিপ্রকাশ'র পক্ষে ৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ থেকে **জাকির হোসেন** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস,** ২৬১, গদাবাগ ব্রাহ্মণকিত্তা, কেরানিগঞ্জ মডেল, ঢাকা–১৩১০ **থেকে মুদ্রিত**।

Ekhono Ghorar Chal Baki 1st part[A Novel] by **Rifat Hassan**
Published by **Zakir Hossain, BhumiProkash,**
38 Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100
Email: bhumiprokash@gmail.com **FB:** fb.com/bhumiprokashofficial
Published: Feb. 2020
ISBN 978 984 94130 7 3

অধ্যায় এক.

৭০ খ্রিস্টাব্দ।
জেরুজালেম।

কুণ্ডলী পাকানো আগুনের লেলিহান শিখার স্পর্শে টকটকে লাল হয়ে আছে সমস্ত আকাশ।

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। তার মধ্যে বেশিরভাগই স্থানীয় ইহুদিদের, বাকিগুলো রোমান সৈন্যদের। জীবিত রোমান সৈন্যরা খোলা তলোয়ার হাতে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। খুঁজে খুঁজে প্রতিটি লাশের কাছে গিয়ে দেখছে এখনো জীবনের কোনো চিহ্ন আছে কিনা। কোনো রোমান সৈন্যের মধ্যে প্রাণের সামান্য চিহ্ন দেখলেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিচ্ছে ঘাড়ে। সেবাশুশ্রূষা করে এখনো যদি তার জীবন বাঁচানো যায়। আর কোনো ইহুদির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পেলেই, খোলা তলোয়ারের এক কোপে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলছে সাথে সাথে।

রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে সমস্ত প্রান্তর। বৃষ্টির পর কাদাপানিতে হাঁটলে যেমন নোংরা পানির ছিটে এসে লাগে পোশাকে, তেমনি পা ফেললেই লাল রক্তের ছিটে এসে লাগছে জীবিত রোমান সৈন্যদের পোশাকে। চারপাশে এত রক্ত দেখেও সাধ মিটছে না তাদের। আরও রক্ত চাই তাদের। রক্তের নেশায় যেন পাগল হয়ে গেছে তারা। জীবিত আর কাউকে না পেয়ে এখন মৃতদের ওপরেই ঘৃণ্য জিঘাংসা চরিতার্থ করতে শুরু করেছে তারা। খুঁজে খুঁজে এক একটা ইহুদিদের মৃতদেহ বের করছে আর ধারালো তলোয়ার দিয়ে এক কোপে আলাদা করে ফেলছে মাথা। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বের হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে। তাদের পৈশাচিক উন্মাদনা তাতে কমার বদলে বরং আরও বেড়ে যাচ্ছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। অস্তমান সূর্যের ম্লান আলোয় বিষণ্ন দেখাচ্ছে পরাজিত জেরুজালেম শহরটাকে। শৌর্যেবীর্যে আভিজাত্যে একসময় যে দখল করে ছিল সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল, আজ তা মৃতদের শহর। কাঁচা মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। রাজসিক ভোজনের খবর পৌঁছে গেছে পৃথিবীর সমস্ত শকুনের কাছে। অফুরন্ত উৎসাহে ডানা ঝাপটিয়ে তারা উড়ে আসছে জেরুজালেমের আকাশে। খুবলে খুবলে কাঁচা মাংস খেতে শুরু করেছে মৃতদেহের শরীর থেকে।

পাশেই আকাশছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ছে ঐতিহ্যবাহী দ্বিতীয় মন্দির। প্রায় ছয়শ বছর ধরে রূপে-গুণে-ঐশ্বর্যে যা ছিল সমস্ত জেরুজালেমবাসীর আভিজাত্য আর

অহংকারের প্রতীক, আজ তা সর্ববিধ্বংসী আগুনের করাল গ্রাসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে প্রায়। শহরের নিম্নাংশ রোমান সৈন্যদের হাতে পুরোপুরি পরাজিত হলেও ওপরের অংশ এখনো দখল হয়নি। সেখান থেকে জেরুজালেমের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে তাদের আভিজাত্যের মূর্ত প্রতীকের এমন করুণ অবস্থা। লজ্জায়, ক্ষোভে, হতাশায় শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি বাদ দিয়ে নিজেই নিজের প্রাণ নিয়ে নিচ্ছে অনেকে। এমন অপমানের চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো।

মন্দিরের বাইরে মৃতদেহের স্তূপের পাশে হাতপা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে কিছু জীবিত মানুষকে। এরা সবাই মন্দিরের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত স্থানীয় লোকজন। তাদের মধ্যে জেরুজালেমের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিও আছেন। অন্যান্য ইহুদিদেরকে স্রেফ কচুকাটা করে ফেলা হলেও এদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। শীঘ্রই সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবে।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেলে ঘোড়া ছুটিয়ে একটা মূর্তি এসে দাঁড়ালো মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের সামনে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও জ্বলতে থাকা আগুনের দীপ্তিমান শিখায় স্পষ্ট দেখা গেল তার শরীরের উজ্জ্বল ধাতব সামরিক পোশাক। চেহারায় তৃপ্তির ছাপ নিয়ে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ধুলোয় মিশে যাওয়া পরাজিত জেরুজালেম শহরের দিকে। তারপর দৃপ্ত পায়ে হেঁটে মৃতদেহের স্তূপ পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ফেলে রাখা বন্দীদের সামনে। অসহায় বন্দীদের দুএকজন মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। তাদের নির্বিকার চেহারায় একটা অজানা ভয়ের ছাপ পড়লো। তারিয়ে তারিয়ে তাদের ভয়টা উপভোগ করল আগন্তুক। ততক্ষণে পায়চারি করতে থাকা রোমান সৈন্যদের একাংশ জড়ো হয়েছে আগন্তুকের পেছনে। হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে সেই তাদের নেতা।

চিৎকার করে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলল আগন্তুক। বন্দীরা তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল শুধু। কিছু বলল না। চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়লেও জোর করে তাকে সরিয়ে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করল তারা। যেন কোনো কিছুতেই কিছু আসে যায় না তাদের।

রাগতে গিয়েও কেন যেন রাগ হলো না আগন্তুকের। বরং একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার চেহারায়। এত সহজে যে কাজ হবে না তা সে নিজেও জানত। বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। চোখের ইশারায় কিছু একটা বলল সে একজন সৈন্যকে। সাথে সাথে নেতার আদেশ পালন করল সে। বন্দীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে টেনেহিঁচড়ে সামনে নিয়ে এলো একজনকে। লেলিহান আগুনের রক্তিম আভায় তার চেহারাটা একটু ভালো করে দেখল আগন্তুক। বছর পঞ্চাশের এক বৃদ্ধ। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সেই তার মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। দেখে মনে হয় বার্ধক্যের অসহনীয় ভারে বড়ো ক্লান্ত সে। তার পরনে মন্দিরের সেবকদের জন্য নির্ধারিত ধবধবে সাদা পোশাক। কিন্তু দীর্ঘসময় রক্তভেজা মাটিতে পড়ে থাকার ফলে তা এখন কালচে লাল রং ধারণ করেছে।

আবার চোখের ইশারায় আগন্তুক কিছু একটা বলল সৈন্যকে। মুহূর্তের মধ্যে সে ধারালো তলোয়ারের ফলা বসিয়ে দিল বৃদ্ধের মাথার ঠিক মাঝখানে। মাথা দুভাগ করে সমস্ত শরীর পেরিয়ে কোমরের নিচে এসে থামল তার তলোয়ারের ফলা। বৃদ্ধ চিৎকার করার সময়টাও পেল না। তার আগেই দুটো সমান ভাগে ভাগ হয়ে তার শরীরের দুটো অংশ পড়ে গেল দুদিকে। ছিটকে রক্তের ফোয়ারা বের হয়ে ভিজিয়ে দিল আশেপাশে উপস্থিত সবাইকে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সবকিছু। একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো বন্দীদের কাছ থেকে। আগন্তুক আবার মুখ তুলে তাকালো তাদের দিকে। তার চোখে উন্মাদের দৃষ্টি দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল বন্দীরা। আবার চিৎকার করে কিছু বলল আগন্তুক। কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপলেও বন্দীদের কেউ কোনো উত্তর দিল না।

এবার আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না আগন্তুক। তীব্র ক্রোধে গনগনে লাল হয়ে উঠল তার চেহারা। চিৎকার করে সে কিছু আদেশ দিল তার সৈন্যদেরকে। সাথে সাথে একদল সৈন্য এগিয়ে গেল বন্দীদের দিকে। তারপর চুলের মুঠি ধরে তাদেরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে শুরু করল একটু দূরের খোলা ময়দানের দিকে। সবাই চলে গেলে আবার দৃপ্ত পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হলো আগন্তুক।

আনার সাথে সাথেই স্পষ্ট হলো বন্দীদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে আসার কারণ। একটা বিশাল লোহার কড়াই বসানো হয়েছে ময়দানের ঠিক মাঝখানে। নিচে লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে কিছু একটা উত্তপ্ত করা হচ্ছে সেখানে। আকাশছোঁয়া আগুনের শিখা তার ওপরে এসে পড়তে কী উত্তপ্ত করা হচ্ছে তাও স্পষ্ট হলো। তেল। ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দ করে ফুটছে উত্তপ্ত তেল। কী কাজে সেটা ব্যবহার করা হবে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আগন্তুকের চোখের ইশারায় একজন সৈন্য আবার সামনে নিয়ে এলো একজন বন্দীকে। ধাক্কা দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলল আগন্তুকের পায়ের কাছে। তাকে ভালো করে লক্ষ করল আগন্তুক। এর বয়স তুলনামূলক কম। খুব বেশি হলে ত্রিশ হবে হয়তো। তার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু বলল আগন্তুক। ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেও কিছু বলল না বন্দী। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকালো অন্যদিকে।

আবার তীব্র ক্রোধে লাল হয়ে গেল আগন্তুকের চেহারা। ঠিক এসময় গনগনে আগুনের রক্তিম আভা এসে পড়লো তার চেহারায়। তাতে স্পষ্ট দেখা গেল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার দুটো চোখ। যেন সাক্ষাৎ নরকের কোনো পিশাচ। এবার আর তাকে কিছু বলতে হলো না। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইল ফুটন্ত কড়াইয়ের দিকে। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইল বন্দী। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। উপস্থিত সবার চোখের সামনে তাকে টেনে নিয়ে উত্তপ্ত কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল রোমান সৈন্য। লকলকে জিহ্বা ফণা তুলে তীব্র কড়কড় শব্দে শিকারকে নিজের মধ্যে টেনে নিল নরকের অগ্নিপিণ্ড।

বন্দীদের সমবেত আর্তচিৎকারে যেন কানে তালা লেগে গেল উপস্থিত সবার। কিন্তু তার মধ্যেও আলাদা করে শোনা গেল ফুটন্ত তেলে ভাজা হতে থাকা অসহায় বন্দীর জান্তব চিৎকার। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

তবে তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার চিৎকার থামল না।

বিধ্বস্ত জেরুজালেমের রাতের আকাশ কাঁপিয়ে বারবার প্রতিধ্বনি হয়ে শোনা যেতে থাকল নরক থেকে ভেসে আসা তার জান্তব চিৎকার।

অধ্যায় দুই.

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

বেশ বিরক্ত হয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যেই সাইড টেবিলে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে হাত বাড়ালেন রবার্ট প্যাটিনসন। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন জানালার বাইরে তখনো অন্ধকার। সকাল হতে এখনো হয়তো দেরি আছে কিছুটা। অ্যালার্ম ঘড়িটা হাতে নিতেই অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো আজ তো রবিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটির দিনে এত সকালে তো তার অ্যালার্ম দিয়ে রাখার কথা না।

অ্যালার্মটা বন্ধ করতে গিয়েই তিনি হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে শব্দটা আসলে অ্যালার্ম ঘড়ির নয়। তাহলে কীসের শব্দ এটা? তার ঘুম ভেঙে গেল পুরোপুরি। এদিকওদিক তাকাতেই শব্দের উৎসটা পরিষ্কার হলো তার কাছে। টেলিফোনের শব্দ। সাইড টেবিলের ওপরে রাখা টেলিফোনটা একঘেঁয়ে শব্দে বেজে চলছে একটানা।

কয়েকবার বেজেই থেমে গেল টেলিফোনটা। প্যাটিনসন সাহেব কী করবেন বুঝতে পারলেন না। ছুটির দিনে এত সকালে কে টেলিফোন করবে? পেশায় তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। অবশ্য শুধু একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক বললে কম বলা হবে। তিনি স্কুলের প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ ডিরেক্টর। ইউএসএর ডেনভারে অবস্থিত বেশ নামকরা একটা স্কুল। মূল শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত স্কুলটা। চারিদিকে রকি পর্বতমালার তুলনাবিহীন সৌন্দর্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজাত পরিবারের সন্তানদেরকে পাঠানো হয় এখানে।

ক্রিং ক্রিং শব্দ করে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা। প্যাটিনসন সাহেবের কপালে এবার একটু ভাঁজ পড়লো। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি তো? প্রায় একহাজারজন বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে এখানে। সবাই আবাসিক। ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য পাঁচটি হোস্টেল আছে এখানে। স্কুলের ভাষায় যাকে বলে "হাউজ"। প্রতিরাতে একজন হাউজ টিউটর থাকেন হাউজে। যেন কোথাও কোনো সমস্যা হলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তেমন কিছু হয়নি তো?

টেলিফোনের শব্দে পাশে শুয়ে থাকা তার স্ত্রীরও ঘুম ভেঙে গেছে বোধহয়। ঘুম

জড়ানো কণ্ঠেই তিনি বললেন, "কী হলো? টেলিফোনটা ধর না প্লিজ।" বলেই পাশ ফিরে কম্বলে মাথা ঢাকলেন আবার।

প্যাটিনসন সাহেব এবার বিছানা থেকে উঠে টেলিফোনটা ধরলেন। তিনি হ্যালো বলার সাথে সাথেই ওপাশ থেকে কেউ একজন একনাগাড়ে কথা বলা শুরু করল। দুশ্চিন্তায় লোকটা নিজের পরিচয় দিতেও ভুলে গেছে। কিন্তু প্যাটিনসন সাহেবের তাতে কোনো সমস্যা হলো না। কণ্ঠ শুনেই তিনি লোকটাকে চিনতে পেরেছেন। জোনাস অমলিন। ইতিহাসের শিক্ষক। লাল হাউজের হাউজ টিউটর। গতরাতে তার হাউজে রাতে থাকার কথা ছিল। সামান্যতেই অনেক দুশ্চিন্তা করার জন্য স্কুলে একটা আলাদা খ্যাতি আছে তার।

তবে এখন তিনি যা বললেন তা মোটেও সামান্য কোনো ঘটনা নয়। একজন ছাত্রের নাকি গতকাল রাত থেকে কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাত এগারোটায় হোস্টেলের সব রুমের লাইট অফ করে দেওয়ার নিয়ম। ডিনারের পর থেকেই নাকি ঐ ছেলেকে আর রুমে দেখা যায়নি। এগারোটায় লাইট অফ করার সময়েও সে রুমে ছিল না। তার রুমমেট অবশ্য এ নিয়ে তখন খুব বেশি ভাবেনি। ভেবেছিল ওয়াশরুমে থাকতে পারে হয়তো। কিংবা কমনরুমেও থাকতে পারে। নিয়ম বহির্ভূত হলেও অনেক ছেলেই এগারোটার পর চুপিচুপি কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলে। সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েও পড়েছিল একসময়। শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলেও সে যখন পাশের বিছানাটা খালি দেখল তখনই প্রথম খারাপ চিন্তাটা এলো তার মাথায়। রুম থেকে বের হয়ে প্রথমেই সে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখল। সেখানেও তাকে না পেয়ে সাথে সাথেই গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে সবকিছু জানালো হাউজ টিউটর জোনাস অমলিনকে।

প্যাটিনসন সাহেব চুপ করে সবকিছু শুনলেন শুধু। কিছু বললেন না। ডিরেক্টর হিসেবে তিনি এই স্কুলে আছেন প্রায় দশ বছর হলো। দশ বছরে অনেকবার শক্ত নার্ভের পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন তিনি। তবু আজ এই শীতের ভোরে সব কথা শুনে দুশ্চিন্তায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে তার কপালে। জোনাস অমলিন যে ছেলেটার কথা বলছেন সে যথেষ্ট ক্ষমতাসীন পরিবারের ছেলে।

আর তাছাড়া কয়েকদিন আগে ইন্টারনেটে দেখা ছোট্ট একটা খবরের কথা মনে পড়ে গেছে তার হঠাৎ।

অধ্যায় তিন.

সন্ধ্যা হয়েই গেল শেষ পর্যন্ত।

ভার্জিনিয়া স্কয়ারের সামনে ট্রাফিক সিগন্যালে বসে নতুন কেনা টয়োটা আরএভি ফোর গাড়িটার কাচের জানালা নামিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালেন জেফরি

আর্চার। দিনের শেষে লাল আভা ছড়িয়ে বিদায় বলার সময় ঘনিয়ে এসেছে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত সূর্যটার। পশ্চিম আকাশ থেকে তার বিদায়ের সুর ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত পৃথিবীতে। জেফরি আর্চার নিজের ওপরেই কিছুটা বিরক্ত হলেন। আজ রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটির দিনটাও তিনি পুরোটা সময় অফিসে বসেই কাটিয়ে দিলেন। হাতের কাজগুলো সেরে উঠব উঠব করতে করতে শেষ পর্যন্ত যখন অফিস থেকে বের হলেন ততক্ষণে দিন প্রায় শেষই হয়ে এসেছে।

অবশ্য জেফরি আর্চার আর পাঁচটা সাধারণ দশটা–পাঁচটা অফিস করা কোনো চাকুরীজীবী নয়। সমগ্র আমেরিকার সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যে তিনি একজন। আমেরিকার প্রথম সারির গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন সংক্ষেপে এফবিআই এর প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ ডিরেক্টর তিনি।

আর্চার সাহেব কাজপাগল মানুষ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বিরতি ছাড়াই রাশি রাশি ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতেই পছন্দ করেন। ছুটির দিনেও অনেকটা সময় কাটান অফিসে। স্ত্রী ক্যাথরিনা আর্চারের কাছে এ নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে হয়। কয়েকদিন হলো তার স্ত্রীর অভিযোগ বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করেছে। একরকম বাধ্য হয়েই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই রবিবার স্ত্রীকে নিয়ে একটা মুভি দেখতে যাবেন। নতুন আসা কী একটা সিনেমা নাকি খুব নাম করেছে। তিনি অবশ্য এসবের খুব একটা খোঁজখবর রাখেন না। তার স্ত্রী ক্যাথরিনাই মূলত সবকিছু খোঁজখবর নিয়ে বের করেছে। সন্ধ্যার মধ্যেই তার রেডি হয়ে থাকার কথা। আর্চার সাহেব অফিস থেকে এসে তাকে তুলে নেবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছুটির দিনেও অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যা হয়েই গেল।

ওয়াশিংটন স্কয়ারের সামনে আবার প্রচণ্ড ভিড়। ধুর, রবিবার বিকালেও এত ভিড় হলে চলে? না, অনেক হয়েছে। এবার এই শহর থেকে ছুটি নিতে হবে। এই ইটপাথর আর কংক্রিটের শহরে আর ভালো লাগে না। নির্জন কোনো একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে একটা ছোট্ট ভিলা বানাতে হবে। তিনি আর তার স্ত্রী ক্যাথি থাকবেন শুধু সেখানে। জীবনের প্রথম দিনগুলোর মতো শেষদিনগুলোও শুধু নিজেদেরকে নিয়েই কাটাবেন তারা।

গাড়ির পেছনের সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে এসবই ভাবছিলেন আর্চার সাহেব। পেছনে ফেলে আসা তার পয়ষট্টি বছরের জীবনের কথা। প্রথম যৌবনে এফবিআইতে যোগ দেওয়ার কথা, কোনো এক স্বর্গীয় সন্ধ্যায় ক্যাথিকে প্রথম দেখার কথা, তাকে বিয়ে করার কথা। তাদের দুই ছেলে আর এক মেয়ের কথা। ছেলেমেয়েরা কেউ তার সাথে থাকে না। অনেকদিন হয়ে গেল তাদের সাথে দেখাও হয় না। শেষ কবে পুরো পরিবার একসাথে হয়েছেন সেটাও মনে পড়ে না ভালো করে। নিজের অজান্তেই একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো তার বুক চিরে।

ভিড় কিছুটা কমে এসেছে। গাড়ি এখন বেশ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আর্চার সাহেব চোখ খুলে বাইরে তাকালেন। দিনের আলোর ইতি টেনে রহস্যময় সন্ধ্যা নেমে আসছে

রাজধানীর বুক চিরে। আলো আর অন্ধকারের মিলনে একটা অপূর্ব সুন্দর বিভ্রম তৈরি হচ্ছে চারদিকে। তখনই হঠাৎ জিনিসটার দিকে চোখ পড়লো তার। একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ। গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। আর্চার সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। আশ্চর্য, এতক্ষণ এটা খেয়াল করেননি কেন? কোথা থেকে এলো এটা?

নিচু হয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুললেন তিনি। ছোটো ছোটো কালো অক্ষরে কী যেন লেখা। অনেকটা চিঠির মতো। হ্যাঁ, চিঠিই তো। তাকেই লেখা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। সম্বোধনে ছোটো করে তার নামই লেখা।

পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন তিনি। একটু পড়েই তার কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করল। একনিশ্বাসে পুরো চিঠিটা পড়ে শেষ করলেন তিনি। শেষ করে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার স্বাভাবিক হতে। বাইরে তখন পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু এবার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করলেন না। স্বাভাবিক হয়ে প্রথম যে কথাটা তিনি বললেন সেটা হলো, "ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাও। লংব্রীজ পার্কের দিকে যাও। তাড়াতাড়ি।"

অধ্যায় চার.

উঠতে উঠতে তিনতলায় এসে হঠাৎ থেমে গেল লিফটটা।

ইফতেখার বেশ বিরক্ত হলো। এমনিতেই ওর ধৈর্য অনেক কম। তাছাড়া সাততলায় ওঠার জন্য লিফটে উঠে যদি মাঝপথে তিনবার থামতে হয় তাহলে বিরক্তি আসাটা খুবই স্বাভাবিক। তার ওপর এখন বাজে কেবল সাড়ে আটটা। অফিসের কাজকর্ম শুরু হওয়ার কথা সকাল নয়টায়। বেশিরভাগ মানুষ এখনো আসেইনি। এখনই লিফটগুলোর এই অবস্থা?

তিনতলায় লিফটের দরজা খুলে যেতে অবশ্য কাউকে দেখা গেল না। এতে বিরক্তিটা আরও বাড়ল। এই আধুনিক যুগে এসে মানুষ অনেক বেশি যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে। সামান্য একতলাও এখন কেউ কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে চায় না। আর লিফটে উঠতে চাইলে একসাথে সবগুলো লিফটের বাটন চেপে দেবে। উঠবে তো একটাতে, আর বাকিগুলো এসে থেমে থাকবে তার জন্য। ততক্ষণে সে হয়তো থাকবে না কিন্তু লিফটের ভেতরে অন্যান্য মানুষগুলোর ধৈর্যচ্যুতি ঠিকই হবে।

সামান্য একটা লিফট নিয়ে এত কিছু ভাবছে কেন সে? ইফতেখার নিজেই অবাক হলো। লিফটটা ততক্ষণে আবার উঠতে শুরু করেছে। বাম হাতটা চোখের সামনে এনে হাতঘড়িটা একবার দেখল সে। আটটা তেত্রিশ। অনেক আগেই চলে এসেছে। এখনো যথেষ্ট সময় আছে হাতে। এতটা বিরক্ত হওয়ার মতো এখনো কিছু ঘটেনি।

সাততলায় এসে থামার পর লিফটের দরজা খুলে বের হয়ে এলো ইফতেখার। বের

হয়ে এসে করিডরে দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকালো। লম্বা একটা করিডর চলে গেছে সোজা। দুপাশে সারি সারি রুম। দুএকটা বাদে সবগুলো রুমই তালাবন্ধ। বাইরে দরজার ওপরে ভেতরের মানুষের নাম আর ডেজিগনেশন লেখা। দুএকটা নাম পড়ে দেখল সে। না, কাউকেই সে চেনে না দেখা যাচ্ছে।

আজকেই তার এখানে প্রথম দিন। ছোটোখাটো কোনো অফিস নয় এটা। দেশের প্রথম সারির প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি 'দ্য সিক্রেটস'র প্রধান অফিস এটা। *দ্য সিক্রেটস*া নিজের মনেই শব্দ দুটো একবার বলল ইফতেখার।

দেওয়ালে লাগানো লোগোটার দিকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। গোলাকার লোগোটার সবার ভেতরের দিকে একটা কম্পাস। কম্পাসটার নিচের কাঁটার দুপাশে একটা করে তারকা। মধ্যের কাঁটা দুটোর পাশে একটা করে তারকা। মাঝখানে একটা বাজপাখি। ওপরের দিকে একটা তুলাদণ্ড, নিচে ইংরেজিতে "দ্য সিক্রেটস" লেখা।

কম্পাসের কাঁটা সঠিক দিকের নির্দেশ দিচ্ছে। বাজপাখি দিচ্ছে অপরাধীকে ক্ষিপ্রতার সাথে ধরার ইঙ্গিত। আর সবার ওপরে থাকা তুলাদণ্ড প্রকাশ করছে আইনের সমতা। চারটি তারকা প্রকাশ করছে চারটি গুণাবলীর—ন্যায়, সততা, সাহসিকতা ও পরিশ্রম। এমনটাই বর্ণনা দেওয়া আছে লোগোটার পাশে।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার রুমটা কোথায়। করিডরটা অবশ্য এখন বেশ ফাঁকা। এদিক সেদিক দু'একজন ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো পিওনকে পাওয়া গেলে ভালো হতো। কিন্তু সেরকম কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। হাতঘড়িটার দিকে আরও একবার তাকালো সে। আটটা তেতাল্লিশ। এখনো সতেরো মিনিট দেরি আছে দিনের কাজকর্ম শুরু হতে।

একজন পিওনকে দেখা যাচ্ছে এবার। এদিকেই আসছে। একে জিজ্ঞাসা করা যায়। আলতো করে হাত নেড়ে তাকে নিজের দিকে ডাকল ইফতেখার। সে কাছে এলে তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার রুমটা এখনো ঠিক করা হয়েছে কিনা।

নাম শুনেই চিনতে পারল লোকটা। আর দশটা সাধারণ সরকারি অফিসের মতো নয় এটা। পিওনের কথায় বুঝতে পারল কয়েকদিন আগেই তার জন্য আলাদা একটা রুম ঠিক

করে রাখা হয়েছে। কিছু না বলে লোকটার পিছু পিছু একটা তালাবন্ধ রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। তাকিয়ে দেখল দরজায় তার নামফলকও লাগানো হয়ে গেছে। ইফতেখার আহমেদ। সিনিয়র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। শুধু এটুকুই। নামটা একটু খালি খালি লাগল ইফতেখারের। কিছু একটা যেন নেই। কোমর থেকে একটা চাবির গোছা বের করে দরজার তালাটা খুলল পিওন। তারপর চাবিটা বাড়িয়ে দিল ইফতেখারের দিকে।

"স্যার চাবিটা আপনার কাছে রাখেন। এইটা আপনার রুম।"

কিছু না বলে চাবিটা নিজের হাতে নিল ইফতেখার। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে আপাতত সেখানেই রাখল তাকে। তারপর আলতো করে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়লো রুমে।

ইফতেখার বরাবরই বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের। কোথাও কাজ করার আগে জায়গাটা ভালো করে পছন্দ হতে হবে, এই নীতিতে বিশ্বাসী সে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নিজের রুমটা বেশ ভালোই পছন্দ হলো তার। আয়তনে বেশ বড়ো রুমটা। কয়েকদিন আগেই নতুন ফার্নিশড করা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। কাঁচা রঙের গন্ধ এখনো পাওয়া যাচ্ছে হালকা। পুরো মেঝে টাইলস দিয়ে মোড়া। অবশ্য শুধু এই রুম না, পুরো অফিসের মেঝেই টাইলস দিয়ে মোড়া। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য এসিও আছে। অবশ্য এটাও পুরো অফিসেই আছে।

আয়তনের তুলনায় রুমের আসবাবপত্র বলতে অবশ্য তেমন কিছু নেই। মাঝারি ধরনের একটা টেবিল। টেবিলের দুপাশে দুটো রিভলভিং চেয়ার। আর তার উল্টোদিকে একটা নতুন বানানো শেলফ। ইফতেখার তাকিয়ে দেখল, টেবিলের ওপরটা পুরোপুরি খালি। বেশিদিন এরকম খালি থাকবে না, নিজেই নিজেকে বলল সে। এর আগে সে যত জায়গায় কাজ করেছে তার সবগুলোই ছিল ফিল্ডের কাজ। চেয়ার-টেবিলের কাজ সে কোনোদিনও করেনি বলতে গেলে। কিন্তু এবার হয়তো ব্যতিক্রম হবে। তবে যাই হোক, এসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে চায় না সে। ভয়ংকর অতীতটাকে পেছনে ফেলে সে মুক্তি চায়। নতুন করে শুরু করতে চায় সবকিছু। শ্বাসরুদ্ধকর অ্যাডভেঞ্চারে ভরা রোমাঞ্চকর জীবন আর চায় না সে, সে চায় খুব সাধারণ একটা জীবন। চারপাশের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো একটা রুটিনবাঁধা জীবন।

"স্যার এসি চালু করে দেব?"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিওনের কথায় ঘোর ভাঙল ইফতেখারের।

"থাক, লাগবে না।"

"জি আচ্ছা স্যার। সবকিছু ঠিক আছে স্যার? আর কিছু লাগবে?"

"আপাতত আর কিছু লাগবে না। আর শোনো, আশরাফ স্যার এসেছেন?"

"না স্যার। উনি তো সাড়ে নয়টার আগে কোনোদিন আসেন না।"

সাড়ে নয়টা? মনে একটু খুঁতখুঁত রয়ে গেল ইফতেখারের। আশরাফ হোসেন

তালুকদার 'দ্য সিক্রেটস' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান চীফ। তার অধীনেই কাজ করতে হবে তাকে। নতুন বস কেমন হবে এটা না জানা পর্যন্ত একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। হাতঘড়িটা সামনে এনে আরও একবার সময়টা দেখল সে। আটটা ছাপান্ন। তার মানে আরও কমপক্ষে চৌত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাকে এই অস্বস্তি দূর করার জন্য।

"ওকে, ঠিক আছে। তুমি যাও।"

পিওন চলে গেলে আনমনে রুমের বন্ধ কাচের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ইফতেখার। কাচ সরিয়ে খুলে দিল বন্ধ জানালা। সাততলার জানালা ভেদ করে ঢুকে গেল বাইরের মুক্ত বাতাস। পকেট থেকে বেনসন অ্যান্ড হেজেসের সোনালি প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো সে। তারপর নিচে তাকালো। ব্যস্ত রাজধানী শহরটাকে দেখা যাচ্ছে নিচে। কর্মব্যস্ত শহরটা এতক্ষণে জেগে উঠেছে পুরোদমে। লোকাল বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যাচ্ছে ব্যস্ত মানুষ। ফুটপাতে স্কুল ড্রেস পরে গল্প করতে করতে হাঁটছে একঝাঁক কিশোর–কিশোরী। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে কেটলিতে পানি বসাচ্ছে মধ্যবয়স্ক দোকানদার। কত সাধারণ জীবন মানুষের। এরকম একটা সাধারণ জীবনে সে কি কখনো পারবে ফিরতে?

অধ্যায় পাঁচ.

এখনো সকাল হয়নি ভালো করে।

ফজরের সময় শেষ হয়েছে একটু আগে। সূর্যটা উঠি উঠি করেও উঠছে না ঠিক। অন্যদিন হলে এতক্ষণে হয়তো উঠে যেত। কিন্তু আজ আকাশে মেঘ থাকায় বেচারা সময় হয়ে গেলেও নিজের চেহারাটা দেখাতে পারছে না ঠিকমতো। বারবার পড়ে যেতে হচ্ছে মেঘের আড়ালে।

ধানমন্ডি লেকের পাড়ে এরই মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতন লোকজনের ভিড় জমতে শুরু করেছে। মধ্যবয়স্ক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের অনেক মানুষকে দেখা যাচ্ছে ট্রাউজার, টি-শার্ট আর কেডস পড়ে দৌড়াতে। এরই মধ্যে হাশমত আলীকে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে আসতে দেখা গেল। সে অবশ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় বের হয়নি, সারারাত ডিউটি করে এখন বাড়ি যাচ্ছে। ধানমন্ডি চার নম্বরের প্রাসাদসুলভ একটা অট্টালিকার দারোয়ান সে। এসব অভিজাত এলাকায় কেউ অবশ্য দারোয়ান বলে না, একটু আধুনিকতা মিশিয়ে বলে "গার্ড"। সে যাই হোক, মেজাজটা তার আজ বেশ ফুরফুরে। তার ডিউটি শেষ হওয়ার কথা ছিল সকাল আটটায়। আটটার সময় কুদ্দুস মিঞা এলে তার বাড়ি যাওয়ার কথা। কুদ্দুস মিঞা কখনোই সময়মতো আসে না। কমপক্ষে পনেরো-বিশ মিনিট দেরি তার সবসময় হবেই। হাশমত আলী সেরকমভাবেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে আজকে কুদ্দুস মিঞা এসে উপস্থিত হয়েছে সাতটারও আগে। হাশমত আলী

তখন গেটের পেছনে গার্ডের টুলটাতে বসে ঝিমাচ্ছিল। কুদ্দুস মিঞা এসে তাকে এক ধাক্কায় জাগিয়ে তুলে বলল, "হাশমত, ওঠ। বাড়ি যা।"

চোখ মেলে কুদ্দুসকে দেখে হাশমত প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেনি। কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হতে পকেট থেকে ভাঙাচোরা নোকিয়া ষোলোশ মোবাইলটা বের করে দেখেছিল– ছয়টা পঞ্চাশ বাজে কেবল। এখনো এক ঘণ্টারও বেশি সময় ডিউটি আছে তার। জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাতেই কুদ্দুস আবার বলল, "এখনো বসে আছিস কেন? যা, বাড়ি যা।"

হাশমত আর ঘাঁটায়নি তাকে। কে জানে হয়তো বউয়ের সাথে সারারাত ঝগড়া করেছে বাড়িতে। নাহলে এক ঘণ্টা আগে আসার মতো মানুষ কুদ্দুস নয়। তবে শুধু এজন্যই যে তার মন ফুরফুরে তা নয়। আরও একটা কাজ করে ফেলেছে সে। তিনদিনের ছুটি চেয়েছিল সে বিল্ডিংয়ের মালিক আখলাক সাহেবের কাছে। বলেছিল অনেকদিন দেশে যাওয়া হয় না। বৃদ্ধ মাবাবা আছে দেশে, দেখতে ইচ্ছা করে। আখলাক সাহেব রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু একটা শর্ত সাপেক্ষে। বলেছিলেন যে তিনদিনের জন্য তার ডিউটিটা সে যদি বাকি দুজনকে ভাগ করে করতে রাজি করাতে পারে তাহলেই শুধু যেতে পারবে সে। তিনজন বলতে সে, কুদ্দুস মিঞা, আর কাশেম আলী। কাশেম ছেলেটা ভালো। তাকে রাজি করানো গিয়েছে সহজেই। হাশমতের ভয় ছিল কুদ্দুসকে নিয়ে। ভেবেছিল কুদ্দুস হয়তো গাঁইগুই করবে, রাজি হবে না কিছুতেই। কিন্তু আজ সকালে তাকে বলতেই হাশমত আলীকে অবাক করে দিয়ে সহজেই রাজি হয়ে গেছে সে। ব্যস, আর আটকায় কে হাশমতকে? পুরো তিনদিন ছুটি তার। মেজাজটা তার এ কারণেই আজ বেশ ভালো। দেশে-টেশে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তার। এ তিনদিন সে ইচ্ছামতো মাল খাবে আর পড়ে থাকবে লাবণীর কাছে। অনেকদিন যাওয়া হয় না লাবণীর ওখানে। এবার পুরো তিনদিন ধরে কাছে পাওয়া যাবে তাকে। চিন্তা করতেই একটা উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছে হাশমত আলীর পুরো শরীরে।

এসব ভাবতেই হঠাৎ একটা জিনিসের ওপর চোখ আটকে গেল তার। মুখ বাঁধা একটা বস্তা, লেকের পাশে একটা গাছের নিচে ফেলে রাখা। খুব একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। আবার এই অভিজাত এলাকায় অভিজাত লোকজনের যাওয়া আসার পথে দৃশ্যটা খুব স্বাভাবিকও নয় বটে। হাশমত আলী চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু কী মনে করে যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। পায়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল বস্তাটার দিকে। গাছের পেছন দিকটায় ফেলে রাখা হয়েছে, তাই হয়তো এখনো কারও চোখ পড়েনি এর ওপর। হাত দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করে হাশমত আলী দেখল বেশ ভারী সেটা। ততক্ষণে দু একজন স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। কৌতূহলী একজন বলল পেছন থেকে, "কী ওটা?

হাশমত আলী কোনো উত্তর দিল না। সে তখন বস্তার মুখের দড়িটা খোলার চেষ্টা করছে। মোটামুটি শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে দড়িটা, কিন্তু কায়দামতো ধরে টান দেওয়ায় সে

মোটামুটি আলগা করে ফেলতে পেরেছে বাঁধনটা।

কৌতূহলী মানুষটা এবার কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো। হাশমত আলীর কাছে এসে আবার প্রশ্ন করল, "কী আছে ভেতরে?"

হাশমত আলী এবারও কোনো উত্তর দিল না। বাঁধনটা সে খুলে ফেলতে পেরেছে পুরোপুরি। দড়িটা পুরোপুরি সরিয়ে বস্তার মুখটা একটানে ফাঁক করে ফেলল সে। মুখটা খুলতেই ভক করে প্রচণ্ড বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। কিছু না বুঝেই বস্তার ভেতরে তাকালো সে। সাথে সাথে নিজের অজান্তেই একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে।

কিবরিয়া সাহেবের বাসায় আজ সকাল থেকেই ভীষণ ব্যস্ততা। তার বড়ো মেয়ে সিনথিয়া এবার ক্লাস ফোরে উঠেছে। আজ থেকে তার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু। অন্যদিন মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কাজটা তার স্ত্রী রেবেকাই পালন করে। কিন্তু কিছুদিন হলো রেবেকার বৃদ্ধ মাবাবা বেড়াতে এসেছেন তাদের বাসায়। তাদেরকে রেবেকা এক মুহূর্তও একা থাকতে দেবে না। তাই ঠিক হয়েছে এ কয়দিন মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কাজটা কিবরিয়া সাহেবই পালন করবেন।

জীবনে খুব কম সময়ই যা যা ভেবে রেখেছেন তা ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছেন কিবরিয়া সাহেব। আজকেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না এটাই স্বাভাবিক। হলোও না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে তিনি যখন তার নাস্তার টেবিলে বসেছেন ঠিক তখনই হঠাৎ বেরসিকভাবে বেজে উঠল তার সেলফোনটা। ভুরু কুঁচকে স্ক্রিনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন তিনি। সেকেন্ড অফিসার সাদেকের ফোন।

কিবরিয়া সাহেব বর্তমানে ধানমন্ডি থানার ওসি। দশটার আগে তিনি কোনোদিনই থানায় যান না। তারপরও গতকাল তিনি সাদেককে বলে এসেছেন যে আজকে তার আসতে দেরি হবে। সাদেক বুদ্ধিমান ছেলে। ছোটোখাটো কোনো ঝামেলা হলে তার চালিয়ে নেওয়ার কথা। কিবরিয়া সাহেবের হঠাৎ মনে হলো নিশ্চয়ই বড়োসড় কোনো ঝামেলা হয়েছে। ফোনের রিঙটোনটাও কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে তার কাছে। মনে হচ্ছে যেন খুব ব্যস্ত হয়ে বাজছে সে। নিশ্চয়ই অশুভ কোনো বার্তা নিয়ে এসেছে সে, আর সেটা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারছে না একটুও।

ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশে সাদেকের গলা শোনা গেল। অল্প কথায় সে যা সারমর্ম বলল তা যথেষ্ট ঝামেলারই বটে। ধানমন্ডি লেকের পাশে নাকি বস্তায় ভরা একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে সকালে। ডেডবডিও আসলে বলা যায় না ঠিক। একটা বস্তায় মানুষের কাটা হাতপাসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাখা। শুধু মাথাটা নেই। রীতিমতো ভয়ংকর ব্যাপার। কিবরিয়া সাহেব তবুও আলতোভাবে একবার চেষ্টা করলেন ঘণ্টাখানেকের জন্য সাদেকের ওপর দায়িত্বটা চাপানো যায় কিনা। এক ঘণ্টা কোনোমতে সামলে রাখতে